Name of the teacher : DIPANNITA KUNDU

Department : Political Science

Caption : Electoral process & Election Commission

Sem - II - PLSA - CC - 4

2020-4-3 14:59

ভারতবর্ষ ঃ নির্বাচন ব্যবস্থা এবং নির্বাচন কমিশন

নিমাই পোদ্দার

নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ঃ

আধুনিক গণতন্ত্রের প্রাণ হল নির্বাচন ব্যবস্থা। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ও শাসিতের মধ্যে রাজনৈতিক সংযোগ সাধিত হয়। দেশের শাসক হিসাবে কে বা কারা ক্ষমতাসীন হবে তা প্রাথমিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমেই ঠিক হয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকারের পরিবর্তন সম্ভবপর হয়ে থাকে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সমাবেশ, রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য ও নীতির সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই সম্ভব। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একদিকে যেমন নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে তেমনি নির্বাচনকে নাগরিকদের চিন্তা চেতনার দর্পণ বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে, নির্বাচন ছাড়া কোনোরূপ গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। স্বভাবতই আধুনিক জনবহুল রাষ্ট্রে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং ইচ্ছা প্রকাশের মাধ্যম রূপে একটি অবাধ, পরিচ্ছন্ন এবং সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of election system of India) ঃ

ভারতবর্ষের নির্বাচন ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর বৃহদায়তন প্রকৃতি। ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকেই ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণতন্ত্রের স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৮৯ সালে নবম সাধারণ নির্বাচনের সময় ভোটদানের বয়স ২১ থেকে ১৮-তে নামিয়ে আনায় ৩৬ মিলিয়ন অতিরিক্ত জনগণ ভোটদানের অধিকার পায়, যা পৃথিবীর বেশির ভাগ গণতন্ত্রের মোট ভোটারের চেয়ে বেশি। বলা যায়, একমাত্র চিন ছাড়া পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মোট জনসংখ্যার চাইতে ভারতেই ভোটারের সংখ্যা বেশি।

কেবল নির্বাচকের সংখ্যাধিক্যই নয়, ভারতবর্ষে প্রতি আসন পিছু প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি, যার গড় সংখ্যা প্রায় ১০-১৫ জন। নির্বাচকদের নাম নথিভুক্তিকরণ এখানে পশ্চিমী গণতন্ত্রের ন্যায় ব্যক্তির দায়িত্ব নয়, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে পর্যবসিত হয়েছে।

ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার **দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য** হল—প্রায় প্রতি বছরই কোনো না কোনো রাজ্য আইনসভা বা লোকসভার নির্বাচন। উল্লেখ্য যে, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচন এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন যুগপৎভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালে লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্থায়িত্বকে তৃতীয় বিশ্বের একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করা যায়। ভারতের সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ যেমন হয়নি, তেমনি প্রাক্তন নেতৃত্বদের ফাঁসি বা কারাগারে নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেনি।

তৃতীয় বিশ্বের একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ভারতবর্ষের **আর-একটি উল্লেখযোগ্য** বৈশিষ্ট্য হল—রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাছাই এবং পরিবর্তনের বিষয়টি ব্যালট বাক্সের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়েছে, বুলেটের মাধ্যমে নয়। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনী রাজনীতির পরেও ভারতের সমস্ত রাজ্যে এবং কেন্দ্রে নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকারের পরিবর্তন ঘটেছে।

ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার চতুর্থ উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল—প্রথম থেকেই সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির ন্যায় শান্ত ও বিক্ষোভের ফলস্বরূপ নারীদের ভোটাধিকার বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকেই তা নিশ্চিত করা গেছে। সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচন ক্ষেত্রের ব্যবস্থাও স্বাধীনতার পর বিলোপ করা হয়েছে।

পঞ্চমত, ভারতবর্ষে নির্বাচন একটি উত্তেজনাময় বিশাল উৎসব বিশেষ। বর্ণময় নির্বাচনী প্রচার, আবেগবিহ্বলভাবে ব্যাপক অংশের জনগণের রাজনৈতিক বিতর্কে অংশগ্রহণ এবং নির্বাচনী ফলাফলের জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করা ও তার বিশ্লেষণ এসবই ভারতের অনন্য বৈশিষ্ট্য। বৈদ্যুতিন প্রচারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থাকে একটি বিশিষ্টতা দান করেছে। একই সঙ্গে ভারতের ব্যাপক বিস্তৃত নিরক্ষরতা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী প্রতীককে বাড়তি গুরুত্ব এনে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভোটদানের কৌশল প্রতীককে কেন্দ্র করেই নির্মিত হয়েছে। তাছাড়া, রাজনৈতিক দলগুলি মতাদর্শ ও নীতির লড়াই-এর পরিবর্তে স্লোগানের ভিত্তিতে নির্বাচনে লড়াই করে থাকে। যেমন ১৯৭১-এ 'গরিবি হাটাও', ১৯৭৭-এ 'ইন্দিরা হটাও' আবার ১৯৮০-তে 'ইন্দিরা লাও, দেশ বাঁচাও' প্রভৃতি।

ষষ্ঠত, দলত্যাগ ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ফলশ্রুতিতে নির্বাচকদের পছন্দের বিষয়টি নিরর্থক হয়ে পড়ে। রাজনীতিবিদ্‌রা সাধারণত 'আয়ারাম গয়ারাম' হিসাবে অভিহিত হন। দলত্যাগকে উৎসাহিত ও নিরুৎসাহিত করার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুনীতির আশ্রয় নেওয়াটা খুবই সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যদিও ১৯৮৫ সালে সংবিধানের ৫২তম সংশোধনের মাধ্যমে দলত্যাগকে বেআইনি ঘোষণা করার পর তা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

সপ্তমত, ভারতবর্ষে সংবাদপত্র এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলি নির্বাচন ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। জনমত সমীক্ষা ও বুথফেরত সমীক্ষার মাধ্যমে ফলাফল বিষয়ে যে অভিমত তারা প্রকাশ করে থাকে তা অনেকটাই মধ্যবিত্ত-মানসকে প্রভাবিত করে।

অষ্টমত, ভারতের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হয়, পেশা বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নয়। যদিও তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতি এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য অস্থায়ীভাবে আসন সংরক্ষিত আছে। লোকসভায় তফশিলি জাতির জন্য ৭৯টি আসন এবং তফশিলি উপজাতির জন্য ৪০টি আসন সংরক্ষিত আছে। একইভাবে বিধানসভাগুলিতে উপরিউক্ত সম্প্রদায়গুলির যথাক্রমে ৫৫৭টি এবং ৩০৩টি আসন সংরক্ষিত আছে।

নবমত, ভারতবর্ষে নির্বাচন-প্রার্থীদের অর্থব্যয়ের সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব পেশ করতে হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা ব্যয় করতে হয়। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির অর্থব্যয়ের ওপর কোনো সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়নি। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ রাজনৈতিক দলগুলি গ্রহণ করে থাকে, ফলস্বরূপ সরকার ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ক্রীড়নকে পরিণত হয়।

দশমত, নির্বাচন পরিচালন ব্যবস্থা যাতে পক্ষপাতদুষ্ট না হতে পারে তার জন্য ভারতবর্ষে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। লোকসভা, রাজ্যসভা, সমস্ত বিধানসভা সহ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের হাতে অর্পিত হয়েছে।

একাদশত, ভারতবর্ষের নির্বাচন ব্যবস্থার একটি বিষয় একেবারেই আশাব্যঞ্জক নয়। তা হল, নির্বাচনে অংশগ্রহণের হার। ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচনগুলিতে গড়ে শতকরা ৫০ ভাগের কম ভোট পড়ে। এর দ্বারা নির্বাচকদের রাজনৈতিক অনীহা এবং রাজনৈতিক চেতনার অভাব প্রতিপন্ন হয়।

2020-4-3 14:56

পরিশেষে বলা যায়, ভারতবর্ষে প্রতিটি নির্বাচনক্ষেত্রে সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি, মাথাপিছু একটি ভোটের নীতি, তাছাড়া নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি আদালতের হাতে ন্যস্ত করার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচন কমিশন (Election Commission) ঃ

গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের হাতে দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় গণতন্ত্রের চারটি প্রধান স্তম্ভ হল—সুপ্রিম কোর্ট, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং নির্বাচন কমিশন। ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশন সংবিধান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এরকমই একটি প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪-৩২৯ নং ধারায় এই প্রতিষ্ঠানের হাতেই ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন, সমস্ত রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়েছে। নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাস, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনী নির্ঘণ্ট নির্ধারণ এবং নির্বাচনী বিধি প্রণয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কমিশন খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ভারতীয় গণপরিষদ সংবিধান রচনার সময় নির্বাচনের বিষয়টি সংবিধানে কীভাবে স্থান পাবে তা মৌলিক অধিকারসংক্রান্ত কমিটিকে বিচার-বিবেচনা করার দায়িত্ব দেয়। প্রাথমিকভাবে এই কমিটি নির্বাচনের বিষয়টিকে প্রশাসকদের হস্তক্ষেপের বাইরে রাখার জন্য একটি অন্যতম মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করে। পরবর্তী সময়ে খসড়া কমিটি সংবিধানে একটি পৃথক অধ্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নির্বাচনের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেন। অন্যান্য সব দেশের সংবিধানের সাধারণ রীতি হল নির্বাচনের বিষয়টিকে আইনসভা প্রণীত আইনের অধীনে রাখা হয়।

গঠন (Composition) ঃ

সংবিধানের ৩২৪(২) নং ধারা অনুসারে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনারদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। অন্যান্য কমিশনারদের সংখ্যা কত হবে তা রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থির করেন। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সংসদ প্রণীত আইনের ভিত্তিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ করেন। কমিশন একাধিক সদস্যবিশিষ্ট হলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এর সভাপতি হিসাবে কার্য পরিচালনা করবেন।

গোড়ার দিকে কমিশন কেবলমাত্র মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়েই গঠিত ছিল। নবম সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৯ সালে রাজীব গান্ধি সরকার অন্য দুজন কমিশনার নিয়োগ করে কমিশনকে বহু সদস্যবিশিষ্ট করেন। কিন্তু ভি. পি. সিং-এর নেতৃত্বে জনমোর্চা সরকার পুনরায় আইন পরিবর্তন করে ১৯৯০-এর ২ জানুয়ারি কমিশনকে এক সদস্যবিশিষ্ট করেন। ১৯৯৩-এর অক্টোবরে নরসীমা রাও সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে এম. এস. গিল এবং জি. ভি. জি. কৃষ্ণমূর্তিকে কমিশনের অপর দুই সদস্য হিসাবে নিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে অর্ডিন্যান্সটি আইনে পরিণত হয়। বর্তমানে নির্বাচন কমিশন তিন সদস্যবিশিষ্ট। বর্তমান আইন অনুযায়ী ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও পদমর্যাদার দিক থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হলেন অন্য দুই নির্বাচন কমিশনারের সমান। বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বর্তমান আইনে বলা হয়েছে সহমতের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব না হলে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। উপরন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করতে পারেন।

2020-4-3 14:56

কার্যকাল ও পদচ্যুতি (Tenure and Impeachment) ঃ

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ হল ৬ বছর। ৬৫ বছর পর্যন্ত তাঁরা স্বপদে আসীন থাকতে পারবেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই রাষ্ট্রপতি তাঁকে অপসারণ করতে পারেন। সংবিধানের ৩২৪(৫) নং ধারা অনুসারে প্রমাণিত অসদাচরণ অথবা অসদাচরণের অভিযোগের ভিত্তিতে সংসদের উভয় কক্ষে যদি উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সাংসদদের দুই-তৃতীয়াংশ এবং প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশি সাংসদের সমর্থনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদচ্যুতির প্রস্তাবটি পাশ করে এবং তা রাষ্ট্রপতির সম্মতিপ্রাপ্ত হয় তাহলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদচ্যুত হন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মতো দায়িত্বশীল পদাধিকারীকে যাতে সাংসদদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল থাকতে না হয়, সেজন্য তাঁকে অপসারণের ক্ষেত্রে এইরূপ জটিল পদ্ধতি সংযোজন করা হয়েছে। অপর দুই নির্বাচন কমিশনারদের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সুপারিশ ছাড়া পদচ্যুত করা যায় না।

নির্বাচন কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational Structure of Election Commission) ঃ

সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংস্থা হলেও পার্লামেন্ট বা সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় কমিশন প্রয়োজনীয় কর্মচারীদের নিয়োগ বা তাদের চাকরির শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের নিয়মবিধি অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের কর্মপরিষদ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

নির্বাচন কমিশনের সেক্রেটারিয়েট বা কর্মপরিষদের বিভিন্ন পদাধিকারীরা হলেন— (১) মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, (২) নির্বাচন কমিশনার, (৩) ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার, (৪) আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার ও (৫) সেক্রেটারি।

এছাড়া বিভিন্ন শাখার দায়িত্বে রয়েছেন অ্যাসিস্টেন্ট বা আন্ডার সেক্রেটারিগণ। শাখাগুলি আবার বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত যার দায়িত্বে থাকেন বিভাগীয় অফিসারগণ। এছাড়া বিভাগীয় সহকারী ও বহুসংখ্যক ইউডি, এলডি ক্লার্ক ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ।

রাজ্যস্তরে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্বাচন কমিশন একজন উচ্চপদস্থ রাজ্য সরকারি অফিসারকে মুখ্য নির্বাচনী অফিসার হিসাবে নিয়োগ করেন। তিনি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশাধীনে থেকে কর্ম সম্পাদন করেন। জেলাস্তরে একজন জেলা নির্বাচনী অফিসার থাকেন যিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত হন। সাধারণত জেলাশাসকরাই এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেলার নির্বাচনী অফিসারের প্রধান কাজগুলি হল ঃ

(১) বিধানসভা, লোকসভা প্রভৃতি নির্বাচনী এলাকার ভোটকেন্দ্রগুলির ব্যবস্থা করা, (২) নির্বাচনের সময় নির্বাচনী কাজের জন্য কর্মী নিয়োগ, (৩) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব গ্রহণ করা এবং সে সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে রিপোর্ট দেওয়া, (৪) ব্যালটবাক্স এবং নির্বাচনী নথিপত্র নিজ দায়িত্বে রাখা প্রভৃতি।

নির্বাচন কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোর সর্বনিম্নস্তরে রয়েছে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা একজন প্রিসাইডিং অফিসার। তিনি এবং অন্যান্য ভোটকর্মীরা জেলার নির্বাচনী অফিসারের দ্বারা নিযুক্ত হন। তাছাড়া প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার থাকেন যিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত হন। তিনি এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার নির্বাচনী কাজকর্ম পরিদর্শন করে থাকেন।

2020-4-3 14:56

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নির্বাচন কমিশন নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে ব্যাপক সংখ্যক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে থাকেন। যারা নির্বাচনী প্রক্রিয়াটির ওপর যেমন নজর রাখেন তেমনি প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী আচরণবিধি পালন করছে কিনা, প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের ওপরও তারা তদারকী করে থাকেন। নির্বাচনের দিনে প্রিসাইডিং অফিসার একটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ভোটকেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য তিনি দায়িত্বশীল থাকেন। সরকারি এবং আধা-সরকারি কর্মীরা, যাঁরা নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত হন, সাময়িকভাবে তাঁরা প্রত্যেকে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকেন। নির্বাচনী কাজে গাফিলতির জন্য যে-কোনো সরকারি কর্মীকে কমিশন সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে বা গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিতে পারেন। কাজেই নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনই 'প্রকৃত সরকার' হিসাবে কাজ করে থাকে।

নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Power and Functions of Election Commission) ঃ

নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক কাজ হল ভারতবর্ষে স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনা করা। এই উদ্দেশ্যে কমিশন নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করে থাকে ঃ

১। **নির্বাচনী এলাকাসমূহের পুনর্বিন্যাস ঃ** ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে। এর পর নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাসের কাজটি করার জন্য একটি 'Delimitation Commission'-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের অফিসারদের সহায়তায় দুজন কর্মরত বা অবসারপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন এক্ষেত্রে প্রধানত সেক্রেটারিয়াল সহায়তা দান করে থাকে।

২। **ভোটার তালিকা প্রস্তুতিকরণ ঃ** নির্বাচন কমিশন সংসদ ও বিধানসভাগুলির নির্বাচনের জন্য এই তালিকা প্রণয়ন করে থাকে। সংশ্লিষ্ট বছরের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৮ বছর বয়স্ক নাগরিকদের নামই কমিশন নির্বাচকদের তালিকাভুক্ত করেন। ভোটার তালিকা প্রণয়নের জন্য কমিশনকে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কমিশনকে লক্ষ রাখতে হয় যেন কোনো ব্যক্তির নাম একই কেন্দ্রে দুবার অন্তর্ভুক্ত না করা হয়, বা একই ব্যক্তি একাধিক ভোটদাতা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না হন। তাছাড়া জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী ভোটদাতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এমন ব্যক্তির নামও যেন অন্তর্ভুক্ত না হয় বা ভোটদাতার বয়সের প্রমাণপত্র ও নাগরিকতার পরিচয়পত্র সঠিক কিনা তা যাচাই করে দেখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। ভোটদানের উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশান অফিসার-এর নিকট আবেদন করতে হয়। কিন্তু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখের পর কোনো নাম অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত দিক থেকে সম্পূর্ণ হলে কমিশন ভোটার তালিকা প্রকাশ করে। এরসঙ্গে সম্পর্কিত কমিশনের আর একটি কাজ হল ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র দান। ভুয়ো ও জাল ভোটদাতাদের হাত থেকে নির্বাচনকে মুক্ত করার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। **রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি দান ঃ** যে-কোনো রাজনৈতিক দলকেই নির্বাচন কমিশনের নিকট নিবন্ধিত হতে হয়। কিন্তু একটি নিবন্ধীকৃত দল আপনাআপনি স্বীকৃতি পেয়ে যায় না। কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে কমিশন এই স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, আবার বিভিন্ন কারণে এই স্বীকৃতি প্রত্যাহার করার ক্ষমতাও কমিশনের রয়েছে।

2020-4-3 14:57

৪। **রাজনৈতিক দলগুলির প্রতীক বণ্টন ঃ** ভারতবর্ষে যেহেতু ব্যাপক সংখ্যক নিরক্ষর ভোটার রয়েছে, তাই যাতে প্রতীক দেখেই ভোটাররা ভোটদান করতে পারে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রতীক দু ধরনের হয়ে থাকে ঃ (১) জাতীয় রাজ্যস্তরে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির জন্য সংরক্ষিত প্রতীক (২) কিছু সাধারণ প্রতীক রয়েছে যেগুলি নির্বাচন কমিশন অস্বীকৃত দলের প্রার্থী বা নির্দল প্রার্থীদের নির্ধারণ করে থাকে। তাছাড়া কোনো দলে ভাঙনের ফলে প্রতীক সংক্রান্ত বিরোধ দেখা দিলে কমিশন এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ কংগ্রেস (ই) এবং কংগ্রেস দলের মধ্যে প্রতীক সংক্রান্ত বিরোধে কংগ্রেস (ই) দলকেই কমিশন মূল কংগ্রেস দল হিসাবে করে। লোকদল (অজিত) এবং লোকদল (বহুগুণা)-র মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে লোকদল (বহুগুণা) নির্বাচন কমিশন লোকদলের নির্বাচনী প্রতীক দান করে।

৫। **নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণা ঃ** নির্বাচন কমিশনের পরামর্শক্রমে লোকসভার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি রাজ্য বিধানসভার ক্ষেত্রে রাজ্যপাল নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করে থাকেন। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, স্ক্রুটিনির তারিখ, মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের তারিখ, প্রভৃতি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ভোটার ও রাজনৈতিক দলগুলি জানতে পারে। স্ক্রুটিনির পদ্ধতি, নির্বাচন পরিচালনা ও ফলাফল ঘোষণার পদ্ধতি বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

৬। **নির্বাচন কার্য পরিচালনা ঃ** নির্বাচন কমিশনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা। আইন অনুযায়ী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত ২১ দিনের ব্যবধান থাকতে হয় যাতে প্রার্থীরা প্রচারের জন্য পর্যাপ্ত সময় পেতে পারেন। কমিশন জাতীয় ও রাজ্য দলগুলিকে দূরদর্শন ও বেতারে বক্তব্য রাখার জন্য সময় বেঁধে দেন। নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারীর পর থেকে নির্বাচনের দিনের ৪৮ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত কমিশন লটারির মাধ্যমে দলগুলির বক্তব্য রাখার ক্রম ঠিক করে দেন। রাজ্য দলগুলির বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণমূলক বক্তব্য, হিংসার প্ররোচনা, বন্ধু দেশগুলির সমালোচনা, প্রভৃতি বিষয়ে কমিশন নির্দেশ জারি করতে পারেন।

৭। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা ভোটারদের জন্য মডেল আচরণবিধি তৈরি করে থাকে।

◆ *ক্ষমতাসীন দলের আচরণবিধি ঃ*

(ক) নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার সময় থেকে মন্ত্রী বা কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ কোনোরূপ অর্থ মঞ্জুর বা প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। যে-কোনো ধরনের প্রকল্পের শিলান্যাস, রাস্তা বা পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কোনো প্রতিশ্রুতি-দেওয়া যায় না—কারণ এটি ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে।

(খ) ক্ষমতাসীন দল সরকারি পদমর্যাদা ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারে কোনোরকম সুবিধা লাভ করতে পারবেন না।

(গ) মন্ত্রীরা তাদের সরকারি ভ্রমণের সঙ্গে নির্বাচনী কাজকে সংযুক্ত করতে পারবেন না।

(ঘ) সরকারি বিমান, মোটরগাড়ি, কোনো সরঞ্জাম সরকারি কর্মচারীদের বা কোনোভাবেই ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না।

(ঙ) ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনী সভা করার জন্য কোনো সরকারি জায়গাকে বা হ্যালিপ্যাডকে একচেটিয়া ভাবে ব্যবহার করতে পারবে না।

2020-4-3 14:57

(চ) সরকারি বিশ্রামাগার, ডাকবাংলো বা কোনোরূপ সরকারি আবাসস্থলকে ক্ষমতাসীন দল একচেটিয়া ভাবে ব্যবহার করতে পারবে না, অন্য দল বা প্রার্থীদেরও ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে।

(ছ) নির্বাচনের সময় সরকারি গণমাধ্যমের ব্যবহার করে পক্ষপাতিত্বমূলকভাবে সরকারি সাফল্যের প্রচার এবং সরকারি অর্থ ব্যয় করে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না।

(জ) মন্ত্রী এবং অন্য কোনো কর্তৃত্ব নির্বাচনের সময় স্বেচ্ছাধীন তহবিল থেকে কোনো অর্থ মঞ্জুর করতে পারবে না।

◆ *সাধারণ আচরণবিধি ঃ*

(ক) কোনো রাজনৈতিক দল এমন কোনো কার্যকলাপে জড়িত থাকতে পারবে না যা বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, ধর্ম বা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ছড়ায় বা তাদের মধ্যেকার বিভাজনকে উৎসাহিত করে।

(খ) অন্য রাজনৈতিক দলের সমালোচনা তার নীতি আর কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই হতে পারে। কোনো প্রার্থীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কুৎসা ও আক্রমণ করা যাবে না।

(গ) রাজনৈতিক দলগুলি ভোট পাওয়ার জন্য জাতপাত বা সাম্প্রদায়িক আবেগকে কাজে লাগাতে পারবেন না। নির্বাচনী প্রচারের জন্য মন্দির, মসজিদ বা চার্চকে ব্যবহার করা যাবে না।

(ঘ) সমস্ত রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীগণ নির্বাচনী আইন বিরুদ্ধে এবং দুর্নীতিমূলক বা অপরাধজনিত কার্যকলাপ এড়িয়ে চলবেন। যেমন—যানবাহন ব্যবহার করে ভোটারদের নির্বাচন কেন্দ্রে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা, ভোটারদের ঘুষ দেওয়া বা ভীতি প্রদর্শন করা প্রভৃতি।

(ঙ) কোনো নির্বাচনী সভা করার জন্য যে-কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীকেই সভার পূর্বে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে সভার দিন ও সময় জানিয়ে অনুমতি নিতে হবে।

(চ) সভার সংগঠকদের সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মোকাবিলা করার জন্য অবশ্যই পুলিশী সহায়তা চাইতে হবে।

(ছ) বিগত কয়েকটি নির্বাচনে বেশ কয়েকটি নতুন নির্দেশিকা আচরণ বিধির মধ্যে এসেছে সেগুলি হল—

(i) বাড়ির মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দল বাড়ির দেওয়ালে স্লোগান লিখতে বা পোস্টার লাগাতে পারবে না, (ii) নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত কোনো কর্মচারী বা অফিসারকে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বদলি করা যাবে না। (iii) মন্ত্রীরা কোনো নির্বাচন কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না যদি না তারা প্রার্থী বা ভোটার বা পোলিং এজেন্ট না হন। তাছাড়া ভোটার স্লিপে প্রার্থীর নাম বা প্রতীক চিহ্ন নিয়ে নির্বাচন কেন্দ্রে প্রবেশ করা এবং দলীয় কর্মীদের দলীয় ব্যাজ বা কার্ড নিয়ে নির্বাচন কেন্দ্রে প্রবেশ করার বিরুদ্ধেও কমিশন নিষেধাজ্ঞা জারি করে থাকে।

(জ) নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য কমিশন ব্যাপক সংখ্যক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে পারে। এই পর্যবেক্ষক দুই ধরনের কাজ করেন—(ক) সাধারণ পর্যবেক্ষণ এবং (খ) নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনের সময় ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে কমিশন কোনো বুথে বা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন ঘোষণা করতে বা ভোট পুনর্গণনার নির্দেশ দিতে পারেন। পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন কমিশনের চোখ এবং কান বলে অভিহিত করা হয়। নির্বাচন কেন্দ্রে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাও নির্বাচন কমিশনের অন্যতম কাজ। নির্বাচনের পর ভোটগণনা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার দায়িত্বও নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা এবং সমস্ত বিজয়ী প্রার্থীদের নামসহ বিজ্ঞপ্তি জারি করা কমিশনের অন্যতম কাজ।

2020-4-3 14:58

(ঝ) নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত আচরণবিধি—১৯৯৬ সালে সুপ্রিম কোর্টে জনপ্রতিনিধিত্ব ধারার ব্যাখ্যা দিয়ে যে রায়দান করেন তার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা লাভ করে। কমিশন এই রায়ের ভিত্তিতে নির্বাচনে অর্থের অপব্যয় জন্য কতকগুলি নির্দেশিকা জারি করে; এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচনের শুরু থেকে নির্বাচনী ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব কমিশনের কাছে পেশ করতে হবে।

(খ) নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন উপযুক্ত ফর্মে পূরণ করে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদের মারফৎ করে কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে।

(গ) সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু ও শেষ হওয়ার মধ্যে তাদের ব্যয় ঘোষণা করতে হবে।

(ঘ) নির্বাচনী ব্যয়সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক দফায় দফায় প্রার্থীদের বা রাজনৈতিক দলের ব্যয়ের হিসাব স্বাধীনভাবে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবেন।

রাজনৈতিক দলগুলি এই হিসাব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা না দিলে বা সীমার অতিরিক্ত ব্যয় করলে কমিশন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা করা, নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদমর্যাদা (Position of Chief Election Commissioner)

১৯৯৩ সালে অপর দুইজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদে একটি বিতর্কের সূচনা করে। সংবিধান অনুযায়ী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অপর কমিশনারের উচ্চতর পদমর্যাদা ভোগ করেন। এর পক্ষে যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয় তা হল—

(ক) 'মুখ্য' মানেই প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ—এ বিষয়ে বিতর্ক থাকতে পারে না।

(খ) নির্বাচন কমিশনের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করে থাকেন—এটাও তার উচ্চতরের

(গ) মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের ক্ষেত্রে অনুসৃত ইম্পিচমেন্ট ছাড়া পদচ্যুত করা যায় না। অন্যদিকে তিনি অপর দুইজন কমিশনারকে অপসারণের জন্য নিকট সুপারিশ করতে পারেন, এই বিষয়টিও তার উচ্চতর অবস্থানকে নির্দেশ করে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৯৯৩ সালে নরসীমা রাও সরকার কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে দুইজন কমিশনার নিযুক্ত হওয়ায় পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে কোনো নেওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতিকে অনুসরণ করার যে কথা বলা হয় তাতে মুখ্যনির্বাচন প্রাধান্যকারী অবস্থান সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। বস্তুতপক্ষে তৎকালীন মুখ্যনির্বাচন কমিশনার শেষণ পদে আসীন হওয়ার পর থেকে নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে যে সব নিতে আরম্ভ করেন, তা তৎকালীন শাসকদল কংগ্রেসসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অসন্তোষ বিতর্কের সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচন কমিশনকে 'Super Government' হিসাবে করেন। নির্বাচনী আচরণবিধি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তিনি কখনওবা তুচ্ছ কোনো কারণে এক দলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিলেন, আবার কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনী বিধির ব্যাপক উল্লঙ্ঘন গেলেন। এরূপ পক্ষপাতিত্বমূলক অভিযোগ শেষণের বিরুদ্ধে প্রায়শই আনা হয়েছিল। তাঁর সর্বাপেক্ষা বড়ো অভিযোগটি ছিল—তিনি আচরণবিধি ভঙ্গের নাম করে একটি প্রশাসনিক কর্তৃ তিনি সংসদের সাংবিধানিক কর্তৃত্বের সীমা অতিক্রম করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে

2020-4-3 14:58

কমিশনার হিসাবে টি. এন. শেষণের উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে একটি অবিমিশ্র প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণটা খুবই পরিষ্কার, নির্বাচনের সময়ে অর্থ, পেশি শক্তি, সরকারি ক্ষমতার বহুল অপব্যবহার সাধারণ মানুষের কাছে টি. এন. শেষণের পদক্ষেপগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার মূল্যায়ন (Evaluation of Role of Election Commission) ঃ

সংবিধানগত অবস্থান এবং বাস্তবদিক থেকে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য অবশ্যই করা যেতে পারে।

প্রথমত, ভারতবর্ষের নির্বাচনী কাঠামো সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন। নির্বাচন কমিশনের গঠন, কার্যাবলি পরিচালনা ও নীতি নির্ধারণে রাজ্য সরকারগুলির কোনো ক্ষমতা নেই—যা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু অঙ্গরাজ্যে নির্বাচন পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন কমিশন রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য কমিশন যেসমস্ত সুপারিশ করে থাকে তাকে গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে কেন্দ্র সরকার বাধ্য নয়।

তৃতীয়ত, নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপ বিশেষত নির্বাচনের দিন ঘোষণা, নির্বাচন স্থগিত করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্টের অভিযোগে অভিযুক্ত। রাজ্যে নির্বাচন ঘোষণার ক্ষেত্রে অনেকক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের সুপারিশ মানা হয়নি।

চতুর্থত, নির্বাচনের সময় শান্তিশৃঙ্খলা বজার রাখা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। নির্বাচন কমিশনকে তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল থাকতে হয়। এটা তার স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।

পঞ্চমত, অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হলেও ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা অর্থশক্তি ও পেশিশক্তির কবল থেকে মুক্ত হয়নি। জাল ভোটদান, ভোটগ্রহণ কেন্দ্র দখল, ভোটারদের তালিকায় কারচুপি, ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়া অনেকক্ষেত্রেই প্রহসনে পরিণত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সবক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়নি। বস্তুতপক্ষে রাজনৈতিক দলগুলির সদিচ্ছা ছাড়া এর থেকে মুক্তিলাভের কোনো পথ নেই।

ষষ্ঠত, রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে প্রার্থীদের সহায়তাদানের ব্যবস্থা না থাকায় নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেকক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলগুলিকে অসাধু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের দ্বারস্থ হতে হয়। ফলত, নির্বাচন ব্যবস্থা কলুষিত হয়ে পড়ে।

সপ্তমত, ভারতবর্ষের নির্বাচনী রাজনীতি জাতপাত ও ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে একান্তভাবে জড়িয়ে পড়েছে। যেগুলি অপসারণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণে শিথিলতা লক্ষ করা যায়।

এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাধারণভাবে এ কথা বলা যায় যে, স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সমস্ত লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনগুলিতে ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী সফলভাবেই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রকে ক্রমশ শক্তিশালী করেছে। ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী বছরের পর বছর তাদের উল্লেখযোগ্য পরিপক্কতার পরিচয় রেখেছে। তারা ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধে খারাপ ভূমিকা পালন ও খাদ্যসংকটের কারণে ১৯৬৭-র নির্বাচনে কংগ্রেস দলকে শাস্তি দিয়েছে। পুনরায় ১৯৭৫-৭৭ সালে জরুরি অবস্থার সময় কংগ্রেস দলের ভূমিকার প্রতিফলও তারা পেয়েছে ১৯৭৭-এর নির্বাচনে। একইভাবে ১৯৮৯ ও ১৯৯৬ সালে কংগ্রেস এবং ২০০৩ সালে বিজেপি তাদের জনবিরোধী নীতি অনুসরণের ফল পেয়েছে নির্বাচনে পরাজয় স্বীকারের মাধ্যমে। তবে এ কথা সত্য যে ভারতের নির্বাচকমণ্ডলী সর্বদাই পরিণত ভূমিকা পালন করেছে। ভারতবর্ষের একটা বড়ো অংশে

2020-4-3 14:59

এখনও জাতপাতের বিবেচনা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন এখনও জাত ভারতবর্ষে নির্বাচনী আচরণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলগুলি ও মুসলিম ভোট ব্যাংকের বিবেচনাকে যেভাবে তাদের নির্বাচন কার্যাবলিতে প্রাধান্য দেয়, পরিষ্কার হয়। তা ছাড়া আঞ্চলিকতাবাদ, অর্থশক্তি ও পেশিশক্তির প্রভাবও খুবই গুরুত্বপূর্ণ

রাজ্য নির্বাচন কমিশন (State Election Commission) :

ভারতের নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India) কেন্দ্রীয় আইনসভা নির্বাচনসহ রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন প্রক্রিয়া যেমন পরিচালনা করে তেমনি রাজ্য ও বিধান-পরিষদের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বও পালন করে থাকে। মার্কিন যুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলির নির্বাচন পরিচালনার জন্য পৃথক নির্বাচন কমিশনের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় নির্বাচনগুলি ছাড়া স্বায়ত্তশাসনমূলক সরকার অর্থাৎ, পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির অবাধ পরিচালনার দায়িত্ব পালনের জন্য গড়ে উঠেছে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য নির্বাচন কমিশনগুলি। সংবিধানের ৭৩তম এবং ৭৪তম সংশোধনী আইন (১৯৯২)-এর মাধ্যমে প্রতিটি রাজ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অধীনস্থ কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েতসহ অন্যান্য স্থানীয় অংশগুলির নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশন তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে এই নির্বাচন কমিশনগুলি কাজ করে।

ভারতীয় সংবিধানের (Part IX) নবম অংশে ২৪৩ নং অনুচ্ছেদের অধীনে পঞ্চায়েত সম্পর্কিত অধ্যায়ে ২৪৩ K এবং ২৪৩ ZA নং উপ-অনুচ্ছেদগুলিতে সমস্ত পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান (Panchayeti Raj Institutions) এবং নগরাঞ্চলের পৌরসংস্থাগুলির (Urban Local Bodies) ভোটার তালিকা প্রস্তুতিকরণসহ সমস্ত নির্বাচনগুলি পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানের ভার নির্বাচন কমিশনের হাতে অর্পিত হয়েছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের গঠন (Composition of State Election Commission) নির্বাচন কমিশন হল রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে গঠিত একটি এক সদস্যবিশিষ্ট সংস্থা। সংবিধানের ২৪৩ K নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যপাল রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ করেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হাইকোর্টের বিচারপতির ন্যায় পদমর্যাদা ভোগ করেন। রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইনের ভিত্তিতে তাঁর চাকরির শর্তাবলি এবং কার্যকাল স্থিরীকৃত হয়। তবে নিয়োগের পর তাঁর স্বার্থে চাকরির শর্তাবলি পরিবর্তন করা যায় না। তাঁকে পদচ্যুত করতে হলে হাইকোর্টের বিচারপতিদের সংক্রান্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। উল্লেখ্য যে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে রাজ্যপাল প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকেন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশিকা অনুযায়ী জেলা কালেক্টর তথা জেলাশাসক অধীন ত্রিস্তরীয় সমস্ত পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচনী অফিসার কাজ করেন। ব্লক পর্যায়ে বিডিও-রা এই দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচনী অফিসার নির্বাচনী প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের নিয়োগ করেন। নির্বাচনী পর্যবেক্ষক এবং পর্যবেক্ষকরা রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত হন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলি (Functions of State Election Commission) কমিশনের মুখ্য কাজগুলি হল—

(ক) পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির এবং নগরাঞ্চলের স্থানীয় সংস্থাগুলির ভোটার তালি

2020-4-3 14:59